শুচিতার সন্ধানে

আজকাল লঘু-গুরু জ্ঞানটা মানুষের মন থেকে লোপ পেয়ে গেছে। এটা কি গণতান্ত্রিক আবহাওয়ার গুণে? কে জানে! আমাদের ছেলেবেলায় কিন্তু এ ব্যাপারে দারুণ কড়াকড়ি ছিল। বয়সে বড় মানেই গুরুজন। প্রণম্য। সেই গুরুজনটি উচ্চতা, বাহুবল, মনোবল, বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষাদীক্ষা, ধনসম্পদ প্রতিটি ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট হলেও কিছু এসে যেতো না। কারণ সে অগ্রজ। উপরোক্ত মানদণ্ডগুলো ধর্তব্যের মধ্যেই পড়তো না তখন। জন্মলগ্নের বিশেষ ক্ষণটিই মীমাংসার একমাত্র মাপকাঠি ছিল।

আমি যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি, লক্ষ্মীপিসিকে তার বাবা আমাদের বাড়িতে রেখে গেলেন। শুনলাম বেগুসরাইয়ে মেয়েদের স্কুলে নাকি তেমন ভাল পড়াশোনা এগোচ্ছে না লক্ষ্মীপিসির। গত তিন বছর ধরে ক্লাস ফাইভেই রগড়াতে হচ্ছে তাকে।

লক্ষ্মীপিসির বাবা আমার ছোটকাকার খুড়শ্বশুর। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে তাঁর। লক্ষ্মীপিসি নাকি অষ্টম। অনেক বছর পরে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস নিয়ে তর্কাতর্কির সময় আমার মেজদা, যে নিজেকে নাস্তিক বলে প্রচার করে (প্রি-মেডিকেল সিলেকশনের সময় আমার হাতে হনুমান মন্দিরে পুজো পাঠিয়েছিল আমি সে কথা কাউকে বলিনি), লক্ষ্মীপিসির নজির দেখিয়ে অষ্টম গর্ভের তথাকথিত মাহাত্ম্য খণ্ডন করতো।

লক্ষ্মীপিসি আমাদের স্কুলে ভর্তি হল, অন্য সেক্শনে। আমার সেক্শনে সিট খালি ছিল না। আমি হনুমান মন্দিরের ঠাকুরের কাছে মনে মনে মানৎ করেছিলাম যেন লক্ষ্মীপিসি আমার সেক্শনে না আসে। পিসি-ভাইঝি এক ক্লাসরুমে খুবই বেমানান হবে বলে মনে হয়েছিল আমার।

দু'টো সেক্শন সামনাসামনি দু'টো ঘরে। ক্লাশে বসে প্রায়ই দেখতাম লক্ষ্মীপিসি দুই হাতে নিজের কান পাকড়ে নির্বিকার মুখে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আমি লেখাপড়ায় ভাল ছিলাম। ক্লাসে কোনদিন শাস্তি পাইনি। লক্ষ্মীপিসিকে ওই

অবস্থায় দেখে প্রথম প্রথম খুব অস্বস্তি হত, লজ্জা করতো। লক্ষ্মীপিসি কিন্তু গ্রাহ্যও করতো না। ক্লাসে টিচাররা ওকে মারধোরও করতো কতদিন। লক্ষ্মীপিসিই বলতো আমাকে। ওদের ক্লাশ টিচার মিস টোপনো মাঝবয়সী মহিলা। বিয়েথাওয়া করেননি। লক্ষ্মীপিসি বলতো বিয়ে হয়নি বলেই নাকি মিস টোপনো অমন বদরাগি। সহানুভূতির সুরে বলতো, "তুই জানিস না বিয়ে না হলে কত কষ্ট হয় মেয়েদের। কবে থেকে আশায় আশায় থাকে এবার বুঝি বিয়ের ফুল ফুটবে। তারপর যেমন যেমন বছরগুলো পেরিয়ে যায়, চেহারা বুড়োটে হতে থাকে, হতাশায় ওদের মন মেজাজ অন্যরকম হয়ে যায়। দেখবি বেশী বয়সের কুমারী মেয়েরা সবাই একটু কেমন কেমন, কেউই স্বাভাবিক নয়।"

এক বছর আমাদের বাড়িতে ছিল লক্ষ্মীপিসি। বার্ষিক পরীক্ষায় পাশ করতে পারলো না দেখে লক্ষ্মীপিসির বাবা এসে নিয়ে গেলেন।

বললেন, "আরার স্কুলটা মোটেও ভাল নয়। মিছিমিছি একটা বছর নষ্ট হল মেয়েটার।"

বললেন কলকাতায় ভাল স্কুলে ভর্তি করবেন মেয়েকে। বোর্ডিং'এ থেকে পড়াশুনো করবে।

এরপর আর লক্ষ্মীপিসির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। অনেক বছর পরে কার কাছে যেন শুনেছিলাম লক্ষ্মীপিসির বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী ক্যানাডায় চাকরি করে। সেখানেই সংসার পেতেছে ওরা।

বহুদিন পরে আবার লক্ষ্মীপিসির কথা মনে পড়ে গেল। কি কারণে বলছি।

সম্প্রতি আমাদের পাড়ায় নানাবিধ কর্মকাণ্ড চালু হয়েছে। মাতব্বর গোছের কিছু লোক চাঁদা তুলে বেড়াচ্ছে। ওরা নাকি নানারকম দেশহিতকর কার্যক্রম বানিয়েছে। একে একে দেশ থেকে সকল প্রকার দুর্নীতি, দুরাচার, দূষণ দূর করবে। এইসব কাজে অঢেল ধনদৌলত আর বৃহৎ জনসমাবেশের প্রয়োজন হয়। খুব উৎসাহের সঙ্গে এই কর্মযজ্ঞে যোগ দিতে এগিয়ে এলো সবাই। নিয়মিত মিটিং - মিছিল হতে লাগলো।

অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সিটিজেন যারা জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে অনেক ব্যাপারেই অসহায় অক্ষম হয়ে পড়েছেন, এলাকা জুড়ে এই নতুন আলোড়নের সূত্রপাতে বেশ একটু অসুবিধাতেই পড়তে হয়েছে তাদের। গত পনেরো-বিশ বছরে তাদের

জীবনে মোটামুটি একটা সুস্থিতি এসে গেছিল। নানারকম প্রয়োজনীয় পরিসেবা দোকানপাট, রাজমিস্ত্রি, প্লাম্বার-কারপেন্টার, মোটর-মেকানিক, ইলেকট্রিশিয়ান, মোটামুটি দক্ষ ও বিশ্বস্ত লোকেদের একটা নেট্ওয়ার্ক গড়ে উঠেছিল। বাড়িতে পলিতকেশ অশক্ত বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা, কিংবা শুধু এক নড়বড়ে বৃদ্ধ কিংবা বৃদ্ধা (যার জীবনসঙ্গী গত হয়েছেন) ইদানীং প্রয়োজনে সাড়া পাচ্ছেন না কারও। উপরোক্ত কর্মীরা সবাই দেশ সংস্কারের কাজে লেগে গেছে ছুটকো পেশাগত কাজ ছেড়ে ----।

আমরা ক'জন সবে সিনিয়র সিটিজেন হয়েছি। প্রৌঢ়ত্বের সীমানা পুরোপুরি পার হইনি এখনও। আমাদের দলে টানতে উন্মুখ এলাকার পাণ্ডারা। চাঁদার খাতা নিয়ে প্রতিদিন হানা দেয় কেউ না কেউ। আজ এ-দল, কাল সে-দল। প্রতিবেশী অনিরুদ্ধ ঝা'র সুপুত্র গৌরব ঝা এদেরই কোনও দলের কর্ণধার। সামনের নির্বাচনে টিকিট পাবার আশা রাখে। তবে তার জন্যে আগে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করতে হবে। পার্টিকে দেখাতে হবে তার কর্মকুশলতার চমৎকারিতা। গৌরব ঝা এখন সুবীর সেনাপতিকে নিয়ে পড়েছে তাই। আজ্ঞে হ্যাঁ, ইনি সেই সেনাপতি এ্যাণ্ড সেনাপতির ছোট কর্তা যাদের জর্দা-দোক্তা মধ্যপ্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যে সুনামির মত ছড়িয়ে পড়েছে। জর্দা-দোক্তা বাণিজ্যের এক স্বর্ণিম অধ্যায় খুলে দিয়েছেন যারা।

("দূর প্রাচ্যের লোকেরা দোক্তা খায় বলে তো কস্মিনকালে শুনিনি।"

"শোনেন নি? সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে ইন্টার্নেট খুলে দেখুন। মুখ খুলে নিজের অজ্ঞতা জাহির করবেন না। প্লীজ!")

সুবীর সেনাপতি শুধুমাত্র ব্যবসায়ী নন, তিনি একজন শিল্পীও। শিল্পের সাধনা করে জীবনটা কাটিয়ে দেবেন মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু বিধি বাদ সাধলো। যৌবনের প্রারম্ভেই পিতৃবিয়োগ ঘটলো। পারিবারিক দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়লো। সুবীর বাবা-মার একমাত্র সন্তান নন, একমাত্র পুত্রও না। চার ভাইবোনের মধ্যে দাদা সুরঞ্জন সবার বড়, সর্বকনিষ্ঠ সুবীর। দুজনের বয়সে বারো বছরের ব্যবধান। সুরঞ্জন বাবার ভারি ন্যাওটা ছিল। কচি বয়স থেকে বাবার পাশে পাশে ঘুরতো। বাবা তার সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করতেন, অনেক ছোটখাটো দায়িত্ব দিতেন। আই,এ পাস করার পর কলেজের পড়া ছাড়িয়ে বাবা তাকে নিজের ব্যবসায় টেনে নিলেন।

কিছুদিনের মধ্যে সুরঞ্জন বাবার ডান হাত হয়ে উঠলো। বাবার অন্তরের বাসনা ছিল ব্যবসার সকল দায়দায়িত্ব তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের হাতে তুলে দিয়ে হাল্‌কা হবেন। কনিষ্ঠের স্বভাবচরিত্র-দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে বিপরীত। সাহিত্য, গানবাজনা ও ছবি আঁকার দিকে দারুণ ঝোঁক তার। ব্যবসাবাণিজ্যের বিন্দুবিসর্গও জানে না, জানার কোন সাধও নেই। ভেবেছিল দাদার ছত্রছায়ায় জীবনটা কেটে যাবে তার, বিষয়সম্পত্তির ঝুট-ঝামেলা থেকে দূরে।

দাদা সুরঞ্জনই সব ওলটপালট করে দিলো। বম্বেতে একটা অফিস ছিল ওদের। বম্বের বন্দর থেকে জাহাজে মাল রপ্তানীর কাজ সামলাতো। সুরঞ্জনকে মাঝে মাঝে যেতে হত। ইদানীং খুব ঘনঘন বম্বে যাচ্ছিল সুরঞ্জন। কিছুদিন পর কারণটা প্রকাশ পেলো। সুরঞ্জনই জানালো। বম্বের অফিসে টাইপিস্টের কাজ করে জুলিয়া নামে যে মেয়েটি, সুরঞ্জন তাকে বিয়ে করতে চায়।

এর পরের ঘটনাগুলো অতি দ্রুত ঘটে গেল। জুলিয়া আসন্নপ্রসবা, কাজেই এ-ব্যাপারে বাক্‌বিতণ্ডা-কাঁদাকাটি-চোখরাঙানির কোন সুযোগ বা সার্থকতা ছিল না। বাবা উকিলের পরামর্শ নিয়ে আইনমাফিক সুরঞ্জনকে ত্যজ্যপুত্র ঘোষণা করলেন এবং একমাসের মধ্যে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন।

ভাগ্যদেবতা সুবীরকে তার শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের স্বপ্নলোক থেকে উৎখাত করে রূঢ় বাস্তবের ইট-পাথর ক্লেদ-কর্দমের মাঝে সবেগে নিক্ষেপ করলেন ----। এর পর তিরিশ বছর কেটে গেছে। নিজের পানে চেয়ে দেখেনি সুবীর। একনিষ্ঠ মনে স্বর্গত বাবার মর্মন্তুদ ক্ষোভ ও প্রচণ্ড ক্ষতির ভরতুকির কাজে ঢেলে দিয়েছে নিজেকে। কায়মনোবাক্যে নিজেকে দাদার মত করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। সুরঞ্জনের মতই তীক্ষ্ণ ব্যবসাবুদ্ধি, দৃঢ়তা, পরিশ্রম করার ক্ষমতা তার মধ্যে উদ্ভাসিত হতে দেখে তার চেনা পরিচিতেরা অবাক মেনেছে। তারা এতকাল তাকে আলালের ঘরের দুলাল ছাড়া আর কিছু ভাবেনি।

সুবীরের কর্তৃত্বে তাদের পারিবারিক ব্যবসা আরও ফুলে ফেঁপে উঠলো। এ যেন রূপকথার ধূলিমুঠি-সোনামুঠির ভেল্কি। ব্যবসায়ে লাভের পরিমান বেড়েই চললো ক্রমাগত।

বাবা দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে গেছিলেন, ভাল ঘর বর দেখে। যথাযোগ্য ধুমধাম

করে। মারা যাবার কিছুদিন আগে মা সুবীরের আগ্রহে দুই মেয়েকে প্রাসাদোপম দুখানা বাড়ি দিয়ে গেলেন রাজধানী দিল্লী শহরে। সুবীর জানতো মা আর বেশীদিন বাঁচবেন না। মেয়েদের বাড়ি দুখানা দিতে পেরে অপার আনন্দ পেলেন মা। সুবীরকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে মা চলে গেলেন। সুবীর এই বিশ্ব সংসারে একা হয়ে গেল। একেবারে একা।

মার মৃত্যুর পর সুবীরের মনে হল জীবনের যাবতীয় কর্তব্য পালন করা হয়ে গেছে। এইবার তার ছুটি। সুদূর অতীতের দিনগুলো উজ্জীবিত হয়ে বারে বারে তাকে তার ফেলে আসা নির্দোষ আনন্দোচ্ছল উদ্বেগবিহীন জীবনে ফিরে যেতে আহ্বান জানায়। সুবীরও চায় ফিরে যেতে। তবে তার আগে কিছু কাজ বাকি আছে তার। ব্যবসাপাতি গুটিয়ে ফেলে হস্তান্তর করে ঝাড়া হাতপা হতে হবে। বিপুল ধনসম্পত্তির যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। গত তিরিশ বছরে ব্যবসার মুনাফা থেকে যা উদ্বৃত্ত জমেছে তাতে রাবণের গুষ্টিবর্গকেও কয়েক পুরুষ ধরে স্বচ্ছন্দে প্রতিপালন করা যায়। একা সুবীরের জন্য এর একটা ছোট্ট অংশই যথেষ্ট। বাকী টাকাটা সে কোন ভাল কাজে লাগাতে চায়।

গৌরব ঝা কোনো গোপন সূত্রে এ-খবরটা পেয়ে অবধি সুবীর সেনাপতির বিপুল ধনরাশি তার পার্টির কুক্ষিগত করার মতলবে আদাপানি খেয়ে লেগে গেছে। আগামী কাল পার্টি অফিসের সংলগ্ন পার্কে একটা বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে গৌরব ঝা'র পার্টির কার্যাবলীর সূচী আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হবে। সুবীর সেনাপতি প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছেন।

সকাল দশটা থেকে সভারম্ভের কথা। এসব বৃহৎ ব্যাপারে কর্মকর্তারা প্রায়শই ঘড়ি ধরে চলেন না। সেটা আশাও করে না লোকে। অন্তত ওয়াকিবহাল লোকে। কার্যক্রম শুরু হতে পৌনে বারটা বেজে গেল। প্রধান অতিথির সম্বর্দ্ধনার পর পার্টির নেতারা দেশ সংস্কারের কার্যক্রমের ব্যাখ্যা দিতে লাগলেন এক এক করে।

প্রধান অতিথি অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছেন। মঞ্চের পাশে ব্যাজ লাগানো একটি ভলেন্টিয়ারকে হাত নেড়ে ডেকে নীচু গলায় কিছু বললেন। খানিক বাদে মঞ্চ থেকে নেমে পড়লেন। একজন মুরুব্বী গোছের লোক - পার্টিরই কেউ -

তাঁকে নিয়ে সংলগ্ন বিল্ডিংএ চলে গেল। সুবীর সেনাপতি অনেকক্ষণ আর মঞ্চে ফিরলেন না। পরে জানা গেল তিনি আদৌ ফিরে আসেননি। তাঁর পরিচিত স্থানীয় একটি ছেলেকে - যে সেখানে উপস্থিত ছিল - সঙ্গে নিয়ে বাইরে এসে নিজের গাড়িতে উঠে বসলেন। ছেলেটির নির্দেশমত একটা কামারশালার সামনে এসে গাড়ি থামালেন। কারিগরের সঙ্গে কথা বলে ছেলেটি সুবীর সেনাপতিকে ভিতরে নিয়ে গেল।

ছোট্ট কারখানা। এত ছোট যে কুটিরশিল্পের পর্যায়েই পড়ে বলতে গেলে। সামনের টানা লম্বা ঘরখানা ওয়ার্কশপ। জনাকয়েক কারিগর তালা নির্মাণের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত। পিছন দিকে পাশাপাশি আরও তিনখানা ঘর। তৃতীয় ঘরটির প্রবেশদ্বার অন্যদিকে। সুবীর সেনাপতি সেখানেই প্রথম গেছিলেন। ঘরটি আসলে একটি শৌচালয়। ফটফটে পরিষ্কার। কমোড ও ওয়াশবেসিন ঝকঝক করছে। পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা রয়েছে। মেঝে নিষ্কলুষ বেদাগ।

একটা জিনিস ভারী অদ্ভুত লাগলো সুবীর সেনাপতির। শৌচালয়ে যত্র তত্র তালার ব্যবহার। বালতি, মগ, সোপ কেস, সবকিছুর সংগে শিকল লাগানো এবং সেগুলি ঘরের কোন অনড় বস্তুর সংগে তালা মেরে আটকানো। সোপকেসটা একদিকে খোলা একটা বাক্স, খোলা দিক থেকে সাবান ব্যবহার করা যায় কিন্তু খোলা অংশটি সাবানের থেকে আয়তনে ছোট হওয়ায় বাক্স থেকে সাবান বার করা যায় না। সুবীর সেনাপতি কৌতূহল দমন করতে না পেরে কামারশালার মালিকের সাথে দেখা করলেন।

সুবীর সেনাপতি আরও দিন কয়েক পর লক্ষ্ণৌ চলে গেলেন। গৌরব ঝা ইলেক্শনে দাঁড়ায়নি। তাকে টিকিট দেওয়া দূরে থাক পার্টির নেতারা তাকে অনেক বকাঝকা করে একরকম তাড়িয়েই দিয়েছে পার্টি থেকে। সেদিনকার ঘটনাবলী যা অল্পবিস্তর কানাঘুষো জানা গেল তা এই। প্রধান অতিথির শৌচালয়ে যাবার প্রয়োজন হয়েছিল। পার্টি অফিসের শৌচালয়ের অবস্থা দেখে তিনি ছিট্কে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন। তারপর গাড়িতে করে করিমুদ্দিন চৌধুরির কামারশালায় পছন্দসই শৌচালয়ে এসে সোয়াস্তি পেলেন। পার্টি ওঁকে ফুলমালা পরিয়ে হাতে মানপত্র ধরিয়ে দিলেও সুবীর সেনাপতি তাদের একটি কানাকড়িও দিতে অস্বীকার করেন। তাঁর মতে নিজেদের শৌচালয় পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে না যারা তাদের মুখে দেশ সংস্কারের বড় বড় পরিকল্পনা স্রেফ বাচালতা।

গৌরব ঝা বলে বেড়াচ্ছে সুবীর সেনাপতি বদ্ধ পাগল। সে নাকি আগেই কোথাও শুনেছিল, বিশ্বাস করেনি। লক্ষ্মীপিসি বলতো বিয়ে না হলে মেয়েরা কেমন যেন হয়ে যায়, স্বাভাবিক থাকে না। হয়তো ছেলেদের বেলাতেও তাই। সুবীর সেনাপতি অকৃতদার, চিরকুমার। সেইজন্যেই কি তার এরকম সৃষ্টিছাড়া চিন্তাধারা?

উপসংহার

আমাদের এলাকায় দেশোদ্ধারের হিড়িক মিটে গিয়ে মোটামুটি স্থিতিশীল অবস্থা ফিরে এসেছে। প্রকারান্তে হলেও এই হট্টমালার দরুন কিছু সাদর প্রাপ্তিযোগ ঘটেছে আমাদের। শহরের জনবহুল এলাকায় দুটো বারোয়ারি শৌচালয় হয়েছে। না-না, এগুলো সেই গতানুগতিক বারোয়ারি শৌচালয় নয় যার পূতিগন্ধ এড়াতে সেই রাস্তাটা বাদ দিয়ে ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয় সবাইকে।

বাতগ্রস্তদের এবং বয়োবৃদ্ধদের খাতিরে উচ্চাসনের ব্যবস্থা থাকলেও, এটি বিশুদ্ধ ভারতীয় শৌচালয়। পরিচ্ছন্নতায় যে কোনও বিদেশী outlet'এর ওয়াশরুমের সংগে পাল্লা দিতে পারে, যদিও মহার্ঘ কোনও সাজ সরঞ্জামের বালাই নেই এখানে। বালতি, মগ, সোপকেস - প্রতিটি দ্রব্য শেকল দিয়ে আটকে তালামারা। কামারশালায় ঠিক যেমনটি ছিল। নিভা ('নির্মল ভারত' এর সংক্ষিপ্ত রূপ) নামে নতুন একটি বেসরকারি সংস্থা সারা দেশে এই শৌচালয়ের প্রবর্তন করছে। নিভার প্রধান পৃষ্ঠপোষকের নাম সুবীর সেনাপতি।

সেদিন করিমুদ্দিন তালা-নির্মাতার কামারশালায় শৌচালয় দেখে অভিভূত হয়েছিলেন সুবীর সেনাপতি। করিমুদ্দিনের সংগে কথা বলে তালার মাহাত্ম হৃদয়ঙ্গম করলেন। কামারশালার নিজস্ব শৌচালয় হলেও কাউকেই ফেরান না ওরা। মানবিকতায় বাধে। কিন্তু পরে দেখা গেল আগন্তুকরা জিনিসপত্রের কদর করে না। মগ আছড়ে ভাঙে, জলের বালতি উল্টে দেয়, সাবান কমোডের মধ্যে ফেলে যায়।

নিভা শৌচালয় আগাগোড়া বারোয়ারি। তাই আরও একটি বৈশিষ্ট যোগ করা

হয়েছে এতে। নিভায় ঢোকার আগে অ্যাটেন্ডেন্টের কাছে নির্ধারিত কিছু টাকা জমা দিতে হবে। শৌচালয়ের দরজায় নোটিশ চিপকানো আছে, "আপনি যেমন পরিষ্কার পেলেন আপনার পর যিনি আসবেন তিনিও যেন জায়গাটি ঠিক তেমনি পরিষ্কার পান"। যদি কেউ শৌচালয় অপরিষ্কার রেখে বেরিয়ে আসে সে তার গচ্ছিত টাকা ফেরৎ পাবে না। পরবর্তী উপভোক্তার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই তাতে। নিভার নিজস্ব সাফাই কর্মীও মজুদ থাকে সেখানে।